সত্যের অন্বেষায়

মাফরুহা মাহমুদ

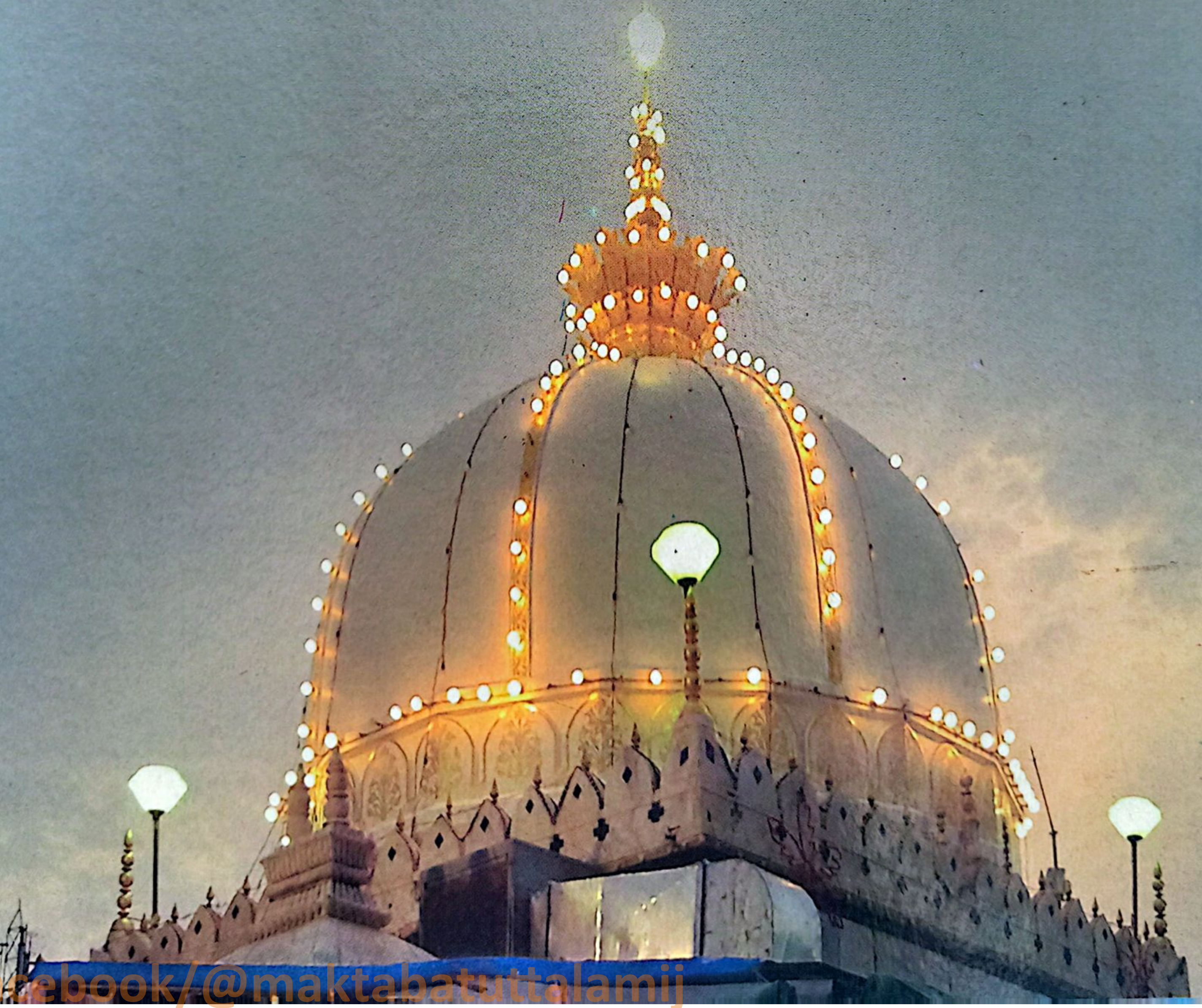

facebook/@maktabatuttalamij

সত্যের অন্বেষায়

মাফরুহা মাহমুদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

facebook/@maktabatuttalamij

সত্যের অন্বেষায়
মাফরুহা মাহমুদ
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৪
ইফা প্রকাশনা : ১০৫৮/১
ইফা গ্রন্থাগার : ৯২২.৯৭
ISBN : 978-984-06-1491-6
প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮২
দ্বিতীয় প্রকাশ (রাজস্ব)
নভেম্বর ২০১৫
কার্তিক ১৪২২
মুহররম ১৪৩৭

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
ড. মুহাম্মদ আবদুস সালাম
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৫২.০০ টাকা

SATYER ANNESHAY [Ception of morality] : Research of Trouth written by Mafruha Mahmud in Bangla and published by Dr. Muhammad Abdus Salam, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538

E-mail : publicationifa@gmail.com
Website : www.islamicfoundation.org.bd

Price : 52.00 ; US Dollar : 2.00

facebook/@maktabatuttalamij

প্রকাশকের কথা

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র)।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ইসলাম প্রচারক হিসেবেই তিনি পরিচিত।

তাঁর প্রথম থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। যা রূপকথাকেও হার মানায়।

সেই হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী তুলে ধরেছেন মিসেস মাফরুহা মাহ্‌মুদ।

তাঁর সেই বৈচিত্র্যময় জীবন কাহিনী শিশু-কিশোরদের মনে দোলা দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় জুন ১৯৮২ সালে। দীর্ঘদিন পর এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি পূর্বের মতোই এটি পাঠকদের মাঝে সমাদৃত হবে।

ড. মুহাম্মদ আবদুস সালাম
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

facebook/@maktabatuttalamij

লেখিকার কথা

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র) একটি ইতিহাস, একটি প্রতিভা। তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসেন।

তাঁর পরশে লাখো লাখো লোক কবুল করেন ইসলাম ধর্ম। এমনকি, বহু প্রভাবশালী হিন্দু নেতাও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে আজও খাজা সাহেবের কোটি কোটি ভক্ত বিদ্যমান।

কিভাবে, কেমন করে এই সূফী সাধক লাখো লাখো মানুষের মন জয় করেছিলেন, উৎসর্গ করেছিলেন স্বীয় জীবন—তারই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ব্যক্ত করা হলো এই ক্ষুদ্র পুস্তকটিতে।

শিশু-কিশোররা বইটি হাতে তুলে নিলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো।

facebook/@maktabatuttalamij

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা
জনাব মাওলানা আবদুল ওহাবের
হস্তমুবারকে।
যার কল্যাণে পর্দানশীন পরিবারের
একজন হয়েও
শিক্ষার আলো প্রাপ্তির সৌভাগ্য
হয়েছে।

facebook/@maktabatuttalamij

কোনটা কোথায়

অনেক দিন আগের কথা/৭
কে তিনি /৮
বাল্যকাল/৯
আট বছরে হাফেজ হলেন/৯
দুঃখী বালককে জামা দান/১০
খোরাসানে হিজরত/১০
দিন কাটে অতি কষ্টে/১১
এতিম মঈনুদ্দীন/১১
বিরাট পরিবর্তন/১২
তারপর/১৩
জ্ঞান অন্বেষণ/১৩
দেশে দেশে/১৪
হজ্জ করলেন/১৫
প্রাণ নিতে এসে হলো মুসলমান/১৬
খাজা সাহেব আজমীরে/১৬
জয় হলো খাজা সাহেবের/১৯
সাধুরামের ইসলাম গ্রহণ/১৯
অজয় পাল ও রাম দেব/১৯
পৃথ্বিরাজের প্রতি অভিশাপ/২০
পৃথ্বিরাজের বাধা/২১
খাজা সাহেবের উক্তি সত্যি হলো/২২
বিবাহ/২৩
ইন্তেকাল/২৪
জীবন ক্ষণস্থায়ী ঃ কর্ম দীর্ঘস্থায়ী/২৪

facebook/@maktabatuttalamij

অনেকদিন আগের কথা

সে অনেক—অনেকদিন আগের কথা।

ভারতে তখন মুসলমানের নাম গন্ধও ছিলো না। রাজা-প্রজা সবাই ছিলো হিন্দু।

অবশ্যি তার আগে আরব-ইরানের দু-একজন মুসলিম নরপতি ভারত জয় করতে এসেছিলেন। এসে, বিজয়ী হয়ে ধন-দওলত নিয়ে আবার ফিরে গেছেন যে যার জায়গায়।

আসলে তাঁরা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেননি। এসেছিলেন যার উদ্দেশ্যে, তাই নিয়েই ফিরে গেছেন তাঁরা।

অতএব, ভারতে তখন রাজা-প্রজা সবাই হিন্দু। উত্তর ভারতের একটা রাজ্য রাজস্থান। সে রাজ্যের রাজা পৃথ্বিরাজ। যেমন তাঁর প্রতাপ—তেমনি তাঁর দব্‌রব।

পৃথ্বিরাজের বৃদ্ধ পিতা ছিলেন একজন নাম করা জ্যোতির্বিদ। তিনি গোনা-পড়া করে অনেক কিছু বলতে পারতেন।

একদিন তিনি তাঁর পুত্রকে ডেকে বললেন ঃ বাবা পৃথ্বি ! তুমি নিশ্চিন্তে দেশ শাসন করো। আমি গুনে-পড়ে দেখেছি, হিন্দুস্থানের কোনো রাজা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে, সাবধান ! খুব শিগ্‌গীর তোমার রাজ্যে একজন মুসলমান ফকীরের আগমন ঘটবে। ইসলাম প্রচার করাই হবে তাঁর ব্রত। এ ব্যাপারে তাঁকে বাধা দেবে না। কারণ, তিনি হবেন ঐশ্বরিক বলে বলীয়ান। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অস্ত্রও কাজে লাগাবে না। বরং পারলে তাঁকে বাধ্য করার চেষ্টা করবে। তাঁকে অসন্তুষ্ট করবে না।

facebook/@maktabatuttalamij

পিতার উপদেশ রাজা পৃথ্বিরাজ শুনলেন বটে, কিন্তু আমল দিলেন না। মনে মনে বললেন ঃ এ সব আজগুবী কথা। ওর কোনো মূল্য নেই।

যথাসময়ে মারা গেলেন পিতা।

কিছুদিন পর, সত্যি সত্যিই একজন মুসলমান ফকীর তাঁর দলবল নিয়ে এলেন ভারতের দিল্লীতে।

তারপর সেখান থেকে আজমীর।

কে তিনি ?

কে এই ফকীর ? কোথায় তাঁর বাড়ী ? কি ছিলো তাঁর কাজ ?

শোনো তাহলে সে সব কথা।

পারস্য দেশের নাম কেনা জানে। যার আর এক নাম ইরান। সে এক বিরাট রাজ্য।

সেই রাজ্যের সিস্তান প্রদেশ। সেই প্রদেশের একটি বিখ্যাত গ্রাম। নাম সনজর।

এই গ্রামের এক নামকরা সওদাগর। নাম গিয়াসুদ্দীন হাসান। তিনি যেমনি সৎ —তেমনি পরহেজগার।

শুধু কি তাই ! তাঁর দানশীলতারও তুলনা হয় না।

তিনি দিনের বেলায় ব্যবসা করতেন। আর রাতে—প্রায় তামাম রাত ধরে আল্লাহ্‌র যিকির-আসকার করতেন। করতেন নফল ইবাদত।

তাঁর স্ত্রী উম্মুল ওয়ারাও ছিলেন সতী-সাধ্বী মহিলা। পরহেজগারীতে তিনিও কম ছিলেন না। সংসারধর্ম নির্বাহ করেও তিনি আল্লাহ্‌র ইবাদতে ত্রুটি করতেন না।

এই পরিবারে পর পর দুটি শিশু পুত্রের জন্মের পর আর একটি শিশু জন্ম নিলো।

জন্মের পর শিশুটির আব্বা-আম্মা, আত্মীয়-স্বজন সবাই খুশী। সেটা ছিলো হিজরী ৫৩৭ সনের ১৪ই রজব, সোমবার।

আব্বা-আম্মা আদর করে নাম রাখলেন মঈনুদ্দীন।

facebook/@maktabatuttalamij

বাল্যকাল

শিশু মঈনুদ্দিন আস্তে আস্তে বড়ো হতে লাগলো। আব্বা-আম্মার স্নেহের দুলাল। তাঁদের আদরে-স্নেহে আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো।

এই ছেলেকে নিয়ে তাঁদের অনেক আশা। অনেক আকাঙ্ক্ষা।

মঈনুদ্দীন বড় হবে। মানুষের মত মানুষ হবে। আল্লাহ্‌ভক্ত হবে। দুনিয়াজোড়া হবে নাম। হবে খ্যাতি।

শিশু মঈনুদ্দীন!

কারো সাথে ঝগড়া নেই। মারামারি নেই। ফাসাদের ধার দিয়েও যায় না। যেমনি ধীর, তেমনি শান্ত। এমন কি, কেউ ঝগড়া বাধালে, নিজেই তা মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

আর কোনো কিছুর ব্যাপারে মিথ্যে কথা?

সে ধাতও তার নয়।

আট বছরে হাফেজ হলেন

পরহেজগার আব্বা-আম্মা!

মঈনুদ্দীনকেও তেমনি ভাবে গড়ে তোলেন তাঁরা।

মাত্র সাত বছর বয়সে নামায শেখানো হয় তাকে। এক ওয়াক্ত নামাযও কাজা করবার হুকুম নেই। এক্কেবারে পুরো পাঁচ ওয়াক্ত।

শুধু কি তাই!

পড়াশুনায়ও তার দারুণ ঝোঁক।

আর স্মরণশক্তিও বড় প্রখর। একবার পড়লে বা শুনলে আর ভোলে না।

ওই সাত বছর বয়স থেকেই শুরু করে সে কুরআন হেফ্‌জ করা।

মাত্র এক বছরেই তিরিশ পারা কুরআনের হাফেজ হয়ে পড়ে সে।

এরপর শুরু করে হাদিস পড়া।

অল্প দিনের মধ্যে বহু হাদিসই জানা হয়ে যায় তার।

গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়ে পড়ে সে—ওই অতটুকু বয়সেই।

facebook/@maktabatuttalamij

দুঃখী বালককে জামা দান

শুধু তাই-ই নয়।

ওই অতটুকু বয়সেই দুঃখীর দুঃখে ভরে উঠতো মঈনুদ্দীনের মন। বড় কষ্ট পেতো মনে। চেষ্টা করতো তাদের দুঃখ মোচনের।

একদিনের ঘটনা।

পরনে তার ময়লা ও ছেঁড়া কাপড়। বড় অসহায়। বড় করুণ সে চেহারা।

দেখে শিশু মঈনুদ্দীনের অন্তর কেঁদে উঠলো। অন্তরে অনুভব করলো একটা তীব্র যন্ত্রণা। খুলে ফেলল নিজের জামা। বালকটিকে পরিয়ে দিলো তা। এক পবিত্র তৃপ্তি অনুভব করলো মঈনুদ্দীন।

দূর থেকে সবকিছু দেখলেন আব্বা। ছেলের কাণ্ড দেখে খুউব খুশী হলেন। শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন আল্লাহ্‌র দরবারে।

খোরাসানে হিজরত

মঈনুদ্দীনের বয়স তখন অল্প। সেই সময় দেশে দেখা দিলো বিশৃঙ্খলা।

দেশে সব সময় মারামারি, কাটাকাটি, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানী, লুটতরাজ —লেগেই আছে।

জানমালের নিরাপত্তার অভাব পুরোমাত্রায়।

বিশেষ করে তাতারীদের অত্যাচারে জর্জরিত।

এই অবস্থায় দেশে থাকা খুবই কষ্টকর।

ওদিকে, জমিজমা যা ছিল তা বিক্রী করাও সম্ভব হলো না।

নিরুপায়ের মত সমস্ত সম্পত্তি ফেলে রেখে—মঈনুদ্দীনের আব্বা চলে এলেন খোরাসানে।

সম্বল মাত্র সামান্য কিছু টাকা।

ব্যবসা করতেন—সেই মূলধন।

facebook/@maktabatuttalamij

দিন কাটে অতি কষ্টে

খোরাসানে এসে, হাতের সমস্ত সম্বল খুইয়ে—আব্বা কিনলেন একটা বাড়ী। আর তিনটে ফলের বাগান।

তা দিয়ে অতি কষ্টে দিন কাটতে থাকে তাদের। মঈনুদ্দীনের বয়স তখন—মাত্র বারো।

আব্বার হাতে টাকা পয়সা নেই। ব্যবসাপাতিও নেই তাঁর। যার জন্যে টাকা পয়সার দারুণ অভাব। আর সেই অভাবে মাদ্রাসায় ভর্তি হতে পারলো না মঈনুদ্দীন।

বাড়ীতেই পড়াশুনা করে। প্রতিদিন ভোরে ওঠে। উঠে কেতাবপত্র নিয়ে বসে। আব্বা পড়া বলে দেন।

পড়াশুনো হয় শুধু ভোর বেলা আর সন্ধ্যে বেলা। —বাকী সারাটা দিন ধরে বাগানে কাজ করতে হয়। অন্য দুটি ভাইও তামাম দিন কাজ করে আব্বার সাথে।

বাগানে কি আর কাজের শেষ আছে!

মাটি খোঁড়া। গাছ লাগানো। পানি দেয়া। ফল-ফলাদি পেড়ে বাজারে নেয়া। বিক্রী করা। —কত কাজ?

এই ভাবে তাদের দিন কাটতে থাকে কোনো রকমে।

এতিম মঈনুদ্দীন

সেবার কিছু পয়সাকড়ি যোগাড় করলেন মঈনুদ্দীনের আব্বা।

পুনরায় ব্যবসাপাতি করবেন—সেই উদ্দেশ্য। এবং সেই উদ্দেশ্যেই গেলেন শামদেশে। অর্থাৎ সিরিয়ায়।

সেই যাত্রাই তাঁর শেষ যাত্রা হলো। তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করলেন। সেখানেই তাঁকে দাফন-কাফন করা হলো। পরিবারের সবাইয়ের সাথে মঈনুদ্দীনও বিহ্বল হলো শোকে।

বিপদের ওপর বিপদ!

আব্বার শোক শেষ হতে না হতেই, সেই একই বছরে ইন্তেকাল করলেন আম্মাও।

facebook/@maktabatuttalamij

আব্বা-আম্মার ইন্তেকালে দিশেহারা হয়ে পড়লো মঈনুদ্দীন। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো। বয়স তখন মাত্র পনের।

এবার তিন ভাইয়ে সম্পত্তি ভাগাভাগি হলো। তাতে মঈনুদ্দীন পেলো বাড়ীর সামান্য একটু জায়গা। আর একটা ফলের বাগান। বাগানে মঈনুদ্দীনের খাটুনীর বিরাম নেই। প্রায় সারাদিন পড়ে থাকে বাগানে। খাটে দিনমজুরের মতো। তাতে যে আয় হয়, তা দিয়ে অতিকষ্টে দিনগুজরান হয়।

এতো কষ্টের মধ্যেও পড়াশুনার আগ্রহ একটুকুও কমে না তার। আব্বার কাছে পড়ার জন্যে যে সমস্ত কেতাবপত্র কেনা হয়েছিলো, সেগুলো সময় পেলেই নিয়ে বসে। নিজে নিজেই পড়ে আগ্রহের সাথে। অর্জন করে অনেক অনেক জ্ঞান।

বিরাট পরিবর্তন

খোরাসানে বাস করতেন ইব্রাহিম কলন্দর নামে এক দরবেশ। তিনি আধ্যাত্মিক বিদ্যায় ছিলেন মহাজ্ঞানী।

যেমনি বিনয়ী—তেমনি সাদাসিধে তিনি। তবে, তিনি যে জ্ঞানী—একথা কেউ জানুক তা তিনি চাইতেন না। নিজেকে সব সময় গোপন রাখতে চাইতেন। তার জন্যে তিনি প্রায় সব সময় ছদ্মবেশে চলাফেরা করতেন।

সেই মহাতাপস একদিন বেড়াতে বেড়াতে বালক মঈনুদ্দীনের বাগানের কাছে এসে হাজির। বাগানের একপাশে বসে বিশ্রাম নিতে লাগলেন তিনি।

সে সময় বাগানে কাজ করছিলো মঈনুদ্দীন। হঠাৎ তার বাগানের পাশে দরবেশকে দেখে—চম্‌কে উঠলো সে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো বাগান থেকে। তাঁকে সালাম করলো। তাজিমের সাথে বসবার জায়গা করে দিলো। তারপর আবার ঢুকলো সে বাগানে।

বাছাই করে কিছু আঙ্গুর পেড়ে আনলো বাগান থেকে। এনে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে খেতে দিলো।

তিনি সেগুলো একটা একটা করে খেলেন তৃপ্তির সাথে। তারপর বালক মঈনুদ্দীনের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে।

facebook/@maktabatuttalamij

বোধহয় বুঝতে পারলেন, এই বালক একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে। দুনিয়ায় নাম রাখবে। —খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁর মুখখানা।

তারপর তিনি তাঁর ঝুলির ভেতর থেকে একটা ফল বের করলেন। নিজের হাতেই ভাঙলেন সেটা। বালক মঈনুদ্দীনকে তা খেতে দিলেন।

মঈনুদ্দীন তা ভক্তির সাথে খেলেন।

অমনি তার অন্তঃকরণে এক তাজ্জব পরিবর্তন এসে গেলো।

এবার দরবেশ মঈনুদ্দীনের মাথায় ও গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে অনেক দু'আ করে চলে গেলেন।

তারপর

দেখতে দেখতে বালক মঈনুদ্দীনের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসে গেলো। দেখা গেল কেমন যেনো উদাস ভাব।

আহারে নেই রুচি।

চোখে নেই ঘুম।

সদাই কি যেনো একটা ভাবেন। কি যেনো একটা চিন্তা করেন।

দেখতে দেখতে কি যেনো একটা হয়ে গেলেন মঈনুদ্দীন। টাকা-পয়সার প্রতি মোহ নেই। সংসারের প্রতি আকর্ষণ নেই। দুনিয়ার লোভ-লালসা—সব যেনো হারাম হয়ে গেলো তাঁর কাছে। অবশেষে মঈনুদ্দীন তাঁর বাগানটা বিক্রি করে ফেললেন। যা টাকা পেলেন তার সবটাই বিলিয়ে দিলেন গরীব, দুঃখী, এতিমদের মধ্যে।

তারপর একদিন শূন্য হাতে পথে নামলেন। সত্যের অন্বেষায় এবং জ্ঞান পিপাসায় অস্থির হয়ে ছুটতে লাগলেন অনির্দিষ্টের ঠিকানায়।

জ্ঞান-অন্বেষণ

যেতে যেতে তিনি বোখারা শহরে উপস্থিত হলেন।

সেখানে পেলেন তিনি হযরত হিসামুদ্দীন বোখারী (র) নামক এক জবরদস্ত আলেমকে।

facebook/@maktabatuttalamij

তাঁর কাছে দীর্ঘ সাত বছর ধরে কুরআনের তফসীর, হাদিস, ফেকাহ—প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করলেন। অর্জন করলেন গভীর পাণ্ডিত্য।

এতেও তাঁর জ্ঞান-পিপাসা মিটলো না। আরো জ্ঞান চাই। আরও জ্ঞানের আলো চাই।

এরপর তিনি ওস্তাদ হযরত হিসামুদ্দীন বোখারী (র)-এর পরামর্শে হযরত খাজা ওসমান হারুনী (র)-এর কাছে গেলেন।

হযরত ওসমান হারুনী (র) ছিলেন একজন কামেল লোক। তাঁর বুজুর্গীর খ্যাতি তখন আরব-জাহানের দিকে দিকে।

মঈনুদ্দীন তাঁর মুরীদ হলেন। এবং আড়াই বছর ধরে তাঁর খেদমত করলেন। তাঁর কাছে থেকে তিনি আধ্যাত্মিক বিদ্যায় কঠোর সাধনা করলেন। জ্ঞান-অর্জন করলেন বিবিধ বিষয়ে।

দেশে দেশে

এরপর তিনি হযরত খাজা ওসমান হারুনী (র)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুরু করেন দেশভ্রমণ।

বাগদাদ থেকে সাত মাইল দূরে সনজর শহর। সেখানে তিনি হযরত শেখ নজমুদ্দীন কুবরা (র)-এর খেদমতে হাজির হলেন।

হযরত শেখ নজমুদ্দীন কুব্‌রা (র) একজন উঁচুদরের আলেম। আধ্যাত্মিক বিদ্যায় কামেল।

খাজা মঈনুদ্দীন আড়াই মাস কাল তাঁর কাছে থাকলেন। তাঁর কাছে তিনি আধ্যাত্মিক বিদ্যা শিক্ষা করলেন।

এই সফরে তিনি লাভ করলেন বিভিন্ন বুজুর্গগণের সান্নিধ্য। লাভ করলেন—ইসলামী দুনিয়ার বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর সান্নিধ্যও। তাঁর কাছে তিনি সাতান্ন দিন অবস্থান করে অনেক জ্ঞান অর্জন করলেন।

তারপর গেলেন তিনি হামাদানে। সেখানে তিনি হযরত ওয়াহিদউদ্দীন (র)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর কাছ থেকেও জ্ঞান অর্জন করলেন অনেক।

এইভাবে তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে—নানা ধরনের ওলী-দরবেশদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে—বিবিধ জ্ঞানের অধিকারী হলেন।

facebook/@maktabatuttalamij

হজ্জ করলেন

এরপর তিনি তাঁর প্রিয় ভক্ত ও মুরীদ কুতুবুদ্দীন বকতিয়ার কাকী (র)-র সাথে মক্কায় গেলেন হজ্জ করতে।

হজ্জ সমাপন করে, মদীনা শরীফে গেলেন তিনি।

মদীনা শরীফে আমাদের প্রিয় নবী (সা)-এর রওজা মুবারক। সেই পবিত্র রওজা মুবারক জিয়ারত করলেন তিনি, পর পর কয়েকদিন ধরে।

সেই সময় একদিন।—

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র) হযরতের রওজা মুবারক জিয়ারত করতে গেছেন। মনে মনে যিকির-আসকার করছেন তিনি।

হঠাৎ আওয়াজ হল ঃ মঈনুদ্দীন ! তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি হিন্দুস্থানে যাও। সেখানে বিধর্মীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করো। সত্যের সন্ধান দাও।

হঠাৎ এমন আওয়াজে একটু ঘাবড়ে গেলেন খাজা সাহেব। নির্দেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে খুশী হলেন। ভাবলেন, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ইসলাম প্রচারের কাজে তাঁর জীবনকে কবুল করেছেন।

অতএব, তিনি রওয়ানা হলেন হিন্দুস্থানে।

খাজা সাহেবের তখন বেশ বয়স হয়েছে। শক্তিও বেশ কিছুটা কমে গেছে। কিন্তু সাহসের কমতি নেই। সুতরাং নতুন উদ্দীপনা নিয়ে রওয়ানা হলেন তিনি হিন্দুস্থানে।

মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে, তিনি প্রথমে বলখে গমন করলেন। তারপর বেশ কিছু সহচর নিয়ে আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে, লাহোর এসে পৌছলেন।

পথিমধ্যে বিধর্মীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন তিনি। তাঁর সে দাওয়াত ছিলো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তাতে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।

এরপর খাজা সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে, লাহোর থেকে রওয়ানা হলেন। দিল্লীতে যখন পৌছলেন, তখন আছরের ওয়াক্ত।

সেখানে একটা বিরাট গাছের নীচে বসলেন খাজা সাহেব। বিশ্রামের প্রয়োজনে বসলেন। একজন সহচরকে বললেন ঃ আযান দাও আছরের।

facebook/@maktabatuttalamij

অমনি অযু করে মধুর স্বরে আযান দিলেন সহচরটি।

আযানের সুমধুর সুরে দিল্লীর আকাশ-বাতাস হয়ে উঠলো মুখরিত।

দিল্লীর অধিবাসীরা সবাই ছিলো বিধর্মী। তারা মূর্তিপূজা করতো। এক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে আগুনের দেবদেবীর উপাসনা করতো।

তারা ওই আযান শুনে কেউ কেউ মুগ্ধ হলো। আর কেউ কেউ হলো বিরক্ত।

প্রাণ দিতে এসে হলো মুসলমান

তখন দিল্লীর রাজা ছিলেন আজমীরের রাজা পৃথ্বিরাজের ভাই চৌয়ান্দ রায়।

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র) দিল্লীতে এসেছেন শুনে ক্ষেপে গেলেন তিনি। কি করে তাঁর ক্ষতি করা যায়—তার চিন্তা করতে লাগলেন।

খাজা সাহেব আজমীরে

কিছুদিন দিল্লীতে কাটাবার পর তিনি গেলেন আজমীরে।

সেখানে গিয়ে তিনি বেছে নিলেন একটা খালি জায়গা। বিশ্রাম করার জন্যে তাঁবু খাটালেন।

তাঁদের তাঁবু খাটানো দেখে পৃথ্বিরাজের লোকেরা একেবারে অবাক ! —এতো সাহস কার হলো—মহামান্য রাজার জায়গায় তাঁবু খাটায়।

তারা তাঁবুর কাছে এসে দেখলো, তাঁবু খাটিয়েছে একদল মুসলমান।

তাই দেখে তারা বলে উঠলো ঃ বাঁচতে চান তো শিগ্‌গীর পালান এখান থেকে। রাজা দেখলে কিন্তু অনর্থ ঘটে যাবে।

তাদের জবাবে খাজা সাহেব বিনীত ভাবে বললেন ঃ থাকি না একটু ! আমরা তো আর তোমাদের রাজার কোনো ক্ষতি করছি না।

শুনে রেগে গেলো তারা। রুক্ষ কণ্ঠে বললো ঃ এখানে আমাদের রাজার উট থাকে। সন্ধ্যার সময় উট বাঁধা হবে এখানে।

তাদের রূঢ় স্বরে ব্যথিত হলেন খাজা সাহেব। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঃ ঠিক আছে, উট বাঁধো।

facebook/@maktabatuttalamij

এই বলে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে চলে গেলেন, বিরাট দীঘি—আনাসাগরের পাড়ে।

ওদিকে সত্যি সত্যিই উট বাঁধা হলো সেখানে।

পরদিন সকাল হতেই উটের রাখালেরা এসে দেখে, সন্ধ্যে বেলা উটগুলো যে ভাবে শুয়েছিলো—সেই ভাবেই শুয়ে আছে। একটুও নড়া-চড়া নেই।

তারা চেষ্টা করলো, উটগুলোকে ওঠাবার।

একবার। দু'বার। তিনবার।

কিন্তু শত চেষ্টা করেও ওঠাতে পারলো না উটগুলোকে। মনে হলো, যেন পেরেক দিয়ে গেঁথে রাখা হয়েছে তাদেরকে।

অতঃপর তারা বুঝতে পারলো এটা ওই ফকীরেরই কাজ।

তারা সিধা চলে গেলো খাজা সাহেবের কাছে। নিজেদের ধৃষ্টতার জন্যে মাফ চাইলো বার বার।

খাজা সাহেব বললেন ঃ বেশ। যাও।

তারা ফিরে এসে দেখে, উটগুলো দিব্বি উঠে-চারণভূমিতে যাবার জন্যে দড়ি টানাটানি করছে।

ওদিকে আর এক কাণ্ড।

আনাসাগরের পাশেই খাজা সাহেবের তাঁবু। তাঁর দলবল—সবাই আনাসাগরের পানি ব্যবহার করেন। অযু-গোসল করেন।

কিন্তু একদিন হলো কি, খাজা সাহেবের এক অনুচর গেলেন অযু করতে।

অমনি পূজারী ব্রাহ্মণেরা বাধা দিলো তাঁকে। অনেক গালাগালিও দিলো।

অনুচরটি অযু করতে না পেরে, মনের দুঃখে ফিরে এলেন খাজা সাহেবের কাছে। মন ভারাক্রান্ত। মুখ মলিন।

ঃ তোমার মুখটা মলিন কেন বাবা ?

খাজা সাহেব জানতে চাইলেন। তাঁর অনুচরটি খুলে বললেন সব।

শেষে খাজা সাহেব তাঁর আর এক অনুচরকে পাঠালেন। হাতে তুলে দিলেন একটা ঘটি। বললেন ঃ যাও, আল্লাহ্‌র নামে আনাসাগর থেকে এক ঘটি পানি নিয়ে এসো।

facebook/@maktabatuttalamij

অনুচরটি ঘটি নিয়ে গেলেন সেই বিরাটকায় দীঘির পাড়ে। বিসমিল্লাহ্ বলে আস্তে আস্তে ঘটিটা ডোবালেন। দেখতে দেখতে ঘটিটা ভর্তি হয়ে গেলো।

কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার!

পানি ভর্তি ঘটিটা তুলতেই অতো বড়ো আনাসাগরের পানি আর একটুও রইলো না।

শুধু কি তাই!

সারা আজমীরের পুকুর, দীঘি, পাতকুয়া সবই শুকিয়ে কাঠ।

পূজারী ব্রাহ্মণরা তো অবাক!

সারাটা আজমীরে পানি নেই। রাজ্যময় হাহাকার। পানি পানি করে বুক ফাটা চীৎকার করতে লাগলো সবাই।

সবাই বুঝলো, এ সব ওই মুসলমান ফকীরের কেরামতি।

অমনি দলে দলে লোক ছুটলো খাজা সাহেবের কাছে। দু'হাত জুড়ে কাতর ফরিয়াদ জানাতে লাগলো ঃ দয়া করুন খাজা বাবা, দয়া করুন। পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে। শিশুরা তড়পাচ্ছে। —তাদেরকে বাঁচান।

খাজা সাহেবের দয়া হলো। তবুও বললেন ঃ ওই পূজারী ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞেস করে এসো, তারা যদি আমাদেরকে আনাসাগরের পানি ব্যবহার করতে দেয়, তাহলেই—পানি ছাড়তে পারি।

শুনেই তারা এক বাক্যে বললো ঃ সে দায়িত্ব আমাদের খাজা বাবা! আনাসাগরের পানি আপনারা অবশ্যই ব্যবহার করতে পারবেন। আমরা কথা দিচ্ছি। আমাদের বাঁচান।

অতঃপর খাজা সাহেব সেই ঘটিটা বের করে একজন অনুচরের হাতে দিলেন। বললেন ঃ যাও, আল্লাহ্র নাম নিয়ে ঘটির পানিটুকু আনাসাগরে ঢেলে দিয়ে এসো।

অনুচরটা তাই করলেন।

অবাক কাণ্ড।

আনাসাগর পানিতে থৈ থৈ করে উঠলো। সারা আজমীরের পুকুর পাতকুয়া সব সেই আগের মতোই পানিতে ভর-ভরাট হয়ে উঠলো।

facebook/@maktabatuttalamij

এরপর খাজা সাহেবের দরবারে ভিড় জমতে লাগলো। হাজার হাজার লোক গ্রহণ করলেন ইসলাম ধর্ম।

জয় হলো খাজা সাহেবের

ওদিকে রাজার কাছে প্রতিনিয়তই নালিশ যেতে লাগলো। ব্রাহ্মণরা নালিশ করলো খাজা সাহেবের বিরুদ্ধে। আনা সাগরের পাড়ে মন্দির। সেখানে পূজার ব্যাঘাত হচ্ছে। মুসলমানরা পাঁচ ওয়াক্ত আযান দেয়। তাতে তাদের পূজার মন্ত্র ভুল হয়ে যায়।

রাজা এই কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ডাকলেন সেনাপতিদের। বললেন ঃ সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত করো। আক্রমণ করো মুসলমানদের। খতম করে দাও।

যে হুকুম সেই কাজ।

তারা খাজা সাহেবকে আক্রমণ করলো। কিন্তু এঁটে উঠতে পারলো না খাজা সাহেবকে। খাজা সাহেব এক মুঠো ধুলো নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন তাদের পানে। অমনি কেউ অন্ধ, কেউ কানা, ন্যাংড়া-নুলো হয়ে ছুটে পালিয়ে গেলো। পরাজয় হলো পৃথ্বিরাজের।

বিজয়ী হলেন খাজা সাহেব।

সাধুরামের ইসলাম গ্রহণ

পৃথ্বিরাজের গুরুদেব সাধুরাম। পুরোহিত শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন ধর্মে অগাধ জ্ঞান।

তিনি খাজা সাহেবের জ্ঞান-গরিমা দেখে খুবই মুগ্ধ হলেন। আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন তাঁর প্রতি। গ্রহণ করলেন ইসলাম ধর্ম।

অজয় পাল ও রাম দেব

একজন সুবিখ্যাত সন্ন্যাসী অজয় পাল। তিনি রাজার ডান হাত। খাজা সাহেবের আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁকে বিমোহিত করলো। তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

আর রাম দেব?

facebook/@maktabatuttalamij

তিনি একজন যাদুকর। যোগমন্ত্রে তাঁর বেশ সুনাম। পৃথ্বিরাজ ভাবলেন রাম দেব ছাড়া মুসলমান ফকীরকে কেউ তাড়াতে পারবে না। তাই তিনি রাম দেবকে পাঠালেন, খাজা সাহেবের বিরুদ্ধে।

রাম দেব খাজা সাহেবের কাছে গেলেন।

কিন্তু, কি আশ্চর্য !

তিনি নিজেই পরিবর্তিত হলেন। খাজা সাহেবের কাছে হয়ে গেলেন মুসলমান।

পৃথ্বিরাজের প্রতি অভিশাপ

পৃথ্বিরাজের ছিলেন একজন মুসলমান কর্মচারী। তিনি খাজা সাহেবকে বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন।

একদিন তিনি খাজা সাহেবের গুণকীর্তন করলেন রাজার কাছে। সেইদিন থেকে রাজা তাঁর সাথে খারাপ ব্যবহার শুরু করে দিলেন।

কিন্তু, মুসলমান কর্মচারী লোকটা বুঝতেন না, কেনো তিনি এরকম করছেন।

একদিন রাজার সেই কর্মচারিটা খাজা সাহেবের কাছে এলেন। ব্যক্ত করলেন সমস্ত কথা।

খাজা সাহেব শুনলেন সব কথা। শুনে মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন। তারপর পৃথ্বিরাজকে দাওয়াত দিলেন ইসলামের। দাওয়াত দিলেন চিঠি লিখে। লিখলেনঃ মূর্তি অচেতন পদার্থ। ওর কোনো শক্তি নেই। সে মানুষের ভালও করতে পারে না—মন্দও না। খামাখা তাকে দেবতা মেনে নিয়েছো। মূর্তিপূজার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।-----

সেই চিঠিতে তিনি আরো লিখলেন ঃ উপাসনা পেতে পারেন একমাত্র আল্লাহ্। কারণ, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তিনিই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। অতএব এক আল্লাহ্কেই প্রভু হিসেবে গ্রহণ করো। কবুল করো কল্যাণের ধর্ম ইসলামকে।..........

চিঠি পেয়ে রাজা চটে মটে লাল। একজন মুসলমান ফকীরের এতদূর আস্পর্ধা। সে আমাকে পিতা-পিতামহের ধর্ম ত্যাগ করতে বলে ! হিন্দুস্থানে এসে হিন্দু-ধর্মের প্রতি এতো নিন্দা ! না, এ সহ্য করা যায় না। মুসলমান ফকীরকে শাস্তি দিতেই হবে।

তিনি সেই মুহূর্তে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত হতে বললেন।

facebook/@maktabatuttalamij

শুনে তাঁর মা তাঁকে বাধা দিলেন ঃ ফকীরের বিরুদ্ধে যাস্‌নে বাবা ! তোর বাবার কথা কি তোর মনে নেই।

অগত্যা নিরস্ত হলেন পৃথ্বিরাজ।

মায়ের কথা শুনলেন বটে। কিন্তু, তাঁর রাগ কমলো না। ঠিক এমন সময় খাজা সাহেব আর একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তিনি রাজার নিরীহ মুসলিম কর্মচারীটির কথা লিখলেন। তাঁর প্রতি যেনো দুর্ব্যবহার না করা হয়। নম্র ভাষায় সেই কথাটিই জানিয়ে দিলেন।

চিঠি পেয়ে পৃথ্বিরাজের রাগ দ্বিগুণ—ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বেড়ে গেলো। তিনি তাঁর সেই মুসলিম কর্মচারীটিকে বরখাস্ত করলেন চাকরি থেকে। সেই সাথে খাজা সাহেবকে গালাগালি করলেন অকথ্য ভাষায়।

খাজা সাহেবের এ সব জানতে বাকি রইলো না। তিনি তাঁকে এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠালেন, "আমি তোমাকে তোমার জীবিতাবস্থায় মুসলিম সৈন্যের হাতে সোপর্দ করলাম।" ... ...

খাজা সাহেবের এ কথা যে সত্যে পরিণত হয়েছিলো, সে কথা পরে বলছি।

পৃথ্বিরাজের বাধা

খাজা সাহেবের চিঠি পেয়ে পৃথ্বিরাজ তো একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। প্রজাদের প্রতি হুকুম করলেন ঃ কেউ খাজা সাহেবের দরবারে যেতে পারবে না। কেউ যদি যায়, তো তাকে কতল করা হবে। তার ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত হবে।

কিন্তু খাজা সাহেব তো আর সাধারণ লোক নন। তিনি সর্বগুণের অধিকারী। মানুষের কল্যাণই তাঁর একমাত্র কামনা।

তাই, কেউ-ই পৃথ্বিরাজের নিষেধাজ্ঞার প্রতি কর্ণপাত করলো না। মৃত্যু আর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির হুকুম উপেক্ষা করেও প্রজারা দলে দলে খাজা সাহেবের দরবারে ভিড় জমাতে লাগলো।

পৃথ্বিরাজ কাকেই বা হত্যা করবেন, আর কার সম্পত্তিই বা বাজেয়াপ্ত করবেন। —করলে তো দেশসুদ্ধ লোককে হত্যা করতে হয়। মালামাল লুট করতে হয়। এমনটি করা কি আর সম্ভব।

facebook/@maktabatuttalamij

সুতরাং পৃথ্বিরাজ পারলেন না। শেষে নতুন এক কৌশল গ্রহণ করলেন।

এক রাজপুত সরদারকে পাঠালেন খাজা সাহেবের দরবারে। উদ্দেশ্য, যে লোকই তাঁর দরবারে যাবে—তাকেই গ্রেফতার করবে।

কিন্তু, সে-ও বিফল হলো। হাজার হাজার মানুষকে তো আর গ্রেফতার করা যায় না!

সুতরাং এ কৌশলও তাঁর ব্যর্থ হলো।

পৃথ্বিরাজ আর কি করবেন! শেষমেষ তিনি লোক মারফত খাজা সাহেবকে নির্দেশ দিলেন ঃ আপনি আগামীকাল (অর্থাৎ হিজরী ৫৮৮ সালের ১লা মহররম) আজমীর ত্যাগ করুন। অন্যথায় আপনাকে কতল করা হবে।

রাজার আদেশ শুনে, খাজা সাহেব মৃদু হাসলেন। সংবাদবাহকের কাছে বলে পাঠালেন ঃ রাজাকে বলো, আমি চলে যাব কি না সে প্রশ্ন পরে। তবে, তাকে মনে রাখতে বলো, অতি সত্বর শাহাবুদ্দীন ঘোরী আজমীরে পদার্পণ করবে। সে-ই বিতাড়িত করবে তোমাকে। খর্ব করবে তোমার দম্ভ।

খাজা সাহেবের উক্তি সত্য হলো

শাহাবুদ্দীন ঘোরী তখন ছিলেন খোরাসানে। তিনি ইতিপূর্বে একবার হিন্দুস্থানে এসে পৃথ্বিরাজের রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। যুদ্ধ হয়েছিল তরাইন নামক স্থানে।

সে যুদ্ধে শাহাবুদ্দীন ঘোরী পরাজিত হয়েছিলেন। তারপর দ্বিতীয়বার এলেন খাজা সাহেবের ওই উক্তির পর।

তাতে প্রচণ্ড লড়াই হলো পৃথ্বিরাজের সাথে।

পৃথ্বিরাজ হলেন বন্দী। এবং যুদ্ধ-বন্দীর নিয়ম অনুসারে তাঁকে কতল করা হলো।

এই ভাবেই সত্যে পরিণত হলো খাজা সাহেবের উক্তি।

খাজা সাহেব যদিও যুদ্ধ করেননি। অস্ত্রধারণ করেননি। তথাপি সারা হিন্দুস্থানে ইসলামের বিজয় পতাকা পতপত উড়ুক—তাঁর মনে ছিলো সেই কামনা।

আর এ জন্যে তিনি প্রতি নিয়তই মানুষকে আহ্বান করেছেন ইসলামের দিকে। দু'আ করেছেন তাঁদেরকে যাঁরা হিন্দুস্থান জয় করে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেছেন। যাঁদের দ্বারা বিদূরিত হয়েছে সকল জুলুম, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, আর শোষণ। যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন ন্যায় বিচার। আর অহরহ কামনা করেছেন কল্যাণ!

facebook/@maktabatuttalamij

শেষমেষ তাই হলো। সারা হিন্দুস্থান করতলগত হলো মুসলমানদের। সেই সাথে খাজা সাহেবও প্রচার করতে লাগলেন ইসলাম। তাতে হাজার হাজার লোক ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে ধন্য হলো।

বিবাহ

বলতে গেলে, খাজা সাহেবের সমস্ত জীবনই জিহাদ ও ইসলাম প্রচারে ব্যয়িত হয়েছে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জিহাদ করে গেছেন। ইসলামের খেদমতে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। জীবনকে বাজী রেখেছিলেন ইসলামের জন্যে।

খাজা সাহেবের ইচ্ছে ছিলো—তিনি বিয়ে করবেন না। জীবন অতিবাহিত করবেন তিনি ইসলাম প্রচারেই।

এক দিনের ঘটনা।

তিনি ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ স্বপ্ন দেখলেন ; হযরত মুহম্মদ (সা) বলছেন ঃ তুমি আমার সমস্ত সুন্নত আদায় করেছো। কিন্তু, একটি সুন্নত আদায় করোনি। সেটা হলো বিয়ে। —তাড়াতাড়ি তুমি বিয়ে করে নাও। যদি তুমি বিয়ে না করো, তাহলে তোমার পরের মুসলমানেরাও তোমার পথ অনুসরণ করবে। ... ...

স্বপ্ন দেখে তিনি জেগে উঠলেন। ভাবতে লাগলেন বিষয়টা।

তখন তিনি বুড়ো হয়ে পড়েছেন। বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে। আর বিয়ে করার ইচ্ছেও তাঁর নেই। তবুও রাসূল (সা)-এর নির্দেশ।

অগত্যা কি আর করা !

রাসূল (সা)-এর সুন্নত তো আদায় করতে হবে। কিন্তু কে মেয়ে দেবে এই নব্বুই বছরের বুড়োকে !

অবশেষে আল্লাহ্‌র ইশারাতেই সুযোগ এলো।

মালিক খেতাব নামক একজন শাসক ছিলেন। মধ্য-ভারতের পাটলিকেল্লার আশপাশের সমস্ত রাজার সাথে তাঁর এক ধর্ম-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে মালিক খেতাব জয়ী হন। এবং পরাজিত রাজার পরমাসুন্দরী কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। তাঁকে পরিণত করেন দাসীতে।

খাজা সাহেব এ খবর জানলেন। তিনি জয় করলেন মালিক খেতাবের অন্তর। রাজকন্যাকে মুক্ত করলেন দাসত্ব থেকে।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন রাজকন্যা। মুক্তি পেলেন সকল দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন থেকে।

facebook/@maktabatuttalamij

সেই রাজকন্যা আগেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। খাজা সাহেবের এই সহানুভূতিতে আরো বেশি মুগ্ধ হলেন।

শুধু তাই নয়। তিনিও সে বিয়েতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলেন!

এরপর খাজা সাহেব তাঁর আগ্রহ দেখে, তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিয়ে করলেন।

তখন তাঁর নাম হলো আমাতুল্লাহ্। আমাতুল্লাহ্ মানে কি জানো? আমাতুল্লাহ্ মানে আল্লাহ্‌র সেবিকা বা দাসী।

খাজা সাহেব কিন্তু আরও একটি বিয়ে করেছিলেন। তাঁর নাম ছিলো ইসমাতুল্লাহ!

খাজা সাহেবের মোট তিন পুত্র ও এক কন্যা। তার মধ্যে একটি পুত্র অল্প বয়সে মারা যায়।

তাঁর পুত্ররাও বেশ বুজুর্গ হয়েছিলেন।

ইন্তেকাল

মৃত্যু সকলকেই স্পর্শ করবে। মানুষ চিরকাল জীবিত থাকে না। একদিন না একদিন তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করতেই হয়।

মৃত্যুর কাছে আমীর, গরীব, নবী, রাসূল, বাদশাহ, ফকীর, দোস্ত, দুশমন —সবাই সমান।

খাজা সাহেবের বেলায়ও ব্যতিক্রম হলো না। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি। অগণন ভক্তবৃন্দকে শোক সাগরে ভাসিয়ে হিজরী ৬২৭ সালের ৬ই রজব ইন্তেকাল করলেন।*

জীবন ক্ষণস্থায়ী ঃ কর্ম দীর্ঘস্থায়ী

খাজা সাহেব আজ আর দুনিয়ায় নেই। কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর কর্ম। তাঁর আদর্শ। মানুষ মারা যায়। কিন্তু তার কাজ বেঁচে থাকে।

খাজা সাহেবও বেঁচে আছেন তাঁর কাজের মাধ্যমেই। বেঁচে থাকবেন চিরকাল। যুগ যুগ ধরে।

* কারো কারো মতে তিনি ইন্তেকাল করেন ৬৩৩ হিজরীতে।

ইফা —২০১৪-২০১৫—প্র/১০৭২৬(রা)—৩,২৫০

facebook/@maktabatuttalamij

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

facebook/@maktabatuttalamij